মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

নক্ষত্রের রাজারবাগ

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

নক্ষত্রের রাজারবাগ

মোশতাক আহমেদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

অনিন্দ্য প্রকাশের প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৪২৭ নভেম্বর ২০২০

প্রথম প্রকাশ : ২০১২

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Nokkhotrer Rajarbagh by **Mostaque Ahamed**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : November 2020

Price : 500.00
US $ 30

ISBN 978 984 95024 2 5

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.booklightbd.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৪০০৪০০৪০০
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে
রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে
যেসকল অকুতোভয় বীর পুলিশ মুক্তিযোদ্ধার
অসীম সাহসিকতা আর আত্মত্যাগে রচিত হয়েছিল
মহান স্বাধীনতার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ।

ভূমিকা

বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা অর্জনে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত এক অতিগুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ ঐ রাতে পাকিস্তানি আর্মি 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামক এক নৃশংস অভিযানে ঢাকা-সহ সমগ্র বাংলাদেশে যে বর্বরোচিত গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পাকিস্তানি আর্মিদের সেই বর্বরোচিত গণহত্যা আর ধ্বংসলীলার কথা পূর্বেই উপলব্ধি করে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড স্থাপন-সহ নানাভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানি আর্মির মেশিনগান, মর্টার, কামান আর ট্যাংকের সামনে সেই প্রতিরোধ খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সবগুলো প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে তারা এগিয়ে যেতে থাকে ঢাকা ভার্সিটি, ইপিআর সদর দপ্তর আর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স্-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার দিকে। লক্ষ্য তাদের সব দখল করে নেওয়া। কিন্তু রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের সীমানায় পৌঁছানো মাত্র অপ্রত্যাশিতভাবে তীব্র সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তারা। তাদের দিকে ছুটে আসতে থাকে রাজারবাগের অকুতোভয় বীর পুলিশ সদস্যদের থ্রিনটথ্রি রাইফেলের বুলেট। প্রতিরোধের তীব্রতায় এক সময় পিছু হটতে বাধ্য হয় তারা। রাজারবাগের গাছের আড়াল, পুকুরের পাড়, সীমানার তারকাঁটার পেছন থেকে ছুটে যাওয়া বুলেটগুলো একেবারে দিশেহারা হতবিহ্বল করে ফেলে পাকিস্তানি আর্মিদের। রাজারবাগ পুলিশদের নিটোল দেশপ্রেম আর অসীম সাহসিকতার সামনে তাদের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, মেশিনগান, মর্টার সব প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা বাধ্য হয় অতিরিক্ত ফোর্স, ট্যাংক-সহ আরও ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসতে। কিন্তু তারপরও পিছিয়ে যায়নি রাজারবাগের পুলিশ। তারা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি আর্মিদের বিরুদ্ধে। ছোটো ছোটো বিচ্ছিন্ন আক্রমণে প্রতিরোধ করতে থাকে রাজারবাগ দখলে উন্মুখ পাক হানাদারদের।

তীব্র প্রতিরোধের মুখে শেষরাত পর্যন্তও রাজারবাগের ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে পাকিস্তানি আর্মিরা রাজারবাগের সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সিদ্ধান্ত নেয় হেডকোয়ার্টারস ভবন-সহ অন্যান্য স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়ার। পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমেই তারা আগুন ধরিয়ে দেয় পিআরএফ (প্রভিনশিয়াল রিজার্ভ ফোর্স) ব্যারাকে, তারপর গোলার আঘাতে একেবারে

ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে হেডকোয়ার্টারস ভবনকে। আগুনের লেলিহান শিখায় তখন জ্বলতে থাকে রাজারবাগের রিজার্ভ অফিস, ব্যারাক-সহ অন্যান্য স্থাপনাসমূহ, আর ভস্মীভূত হয়ে যেতে থাকে সকল দাপ্তরিক কাগজপত্র আর গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি। সেই লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে অশ্রুসিক্ত রাজারবাগের পুলিশ প্রতিজ্ঞা করে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার। তাইতো তারা লাখো বাঙালির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে চলে যায় মুক্তিযুদ্ধে, অংশগ্রহণ করে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে, তারপর স্বাধীন করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে রাজারবাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। কারণ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে স্বাধীনতার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ এই রাজারবাগেই সংঘটিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রথম যে বুলেটটি পাকিস্তানিদের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তা ছিল এই রাজারবাগ পুলিশেরই। পাশাপাশি রাজারবাগ তথা ঢাকা আক্রান্ত হওয়ার সংবাদটি প্রথম রাজারবাগের ওয়্যারলেস বেইজ থেকেই সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে বাংলাদেশের সবাই আগে থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল পুলিশ লাইন্স্, থানা, ফাঁড়ির সকল অস্ত্র যা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার হয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাজারবাগের পুলিশ সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ জনগণকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়, তাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং এক সময় নিজেরাই সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাশাপাশি ২৫শে মার্চ পরবর্তী সময়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে অনেক কার্যক্রম সাধিত হয়, যা স্বাধীনতা অর্জনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তানি আর্মিদের অলক্ষে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স্, পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য আদানপ্রদানের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। গোপনে এখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে রাজারবাগ পুলিশের ভূমিকা এবং তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে বাংলাদেশ পুলিশ অর্জন করে স্বাধীনতা পদক।

'নক্ষত্রের রাজারবাগ' মূলত ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে স্বাধীনতার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধে রাজারবাগে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের দেশপ্রেম, বীরোচিত ভূমিকা এবং আত্মত্যাগের মহিমাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। 'নক্ষত্রের রাজারবাগ' উপন্যাস হলেও উপন্যাসটি সত্যনির্ভর। এজন্য এটি যে শুধু উপন্যাস হিসেবেই বিবেচিত হবে তা নয়, রাজারবাগে স্বাধীনতার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধের একটি প্রাসঙ্গিক দলিল হিসেবেও মূল্যায়িত হবে। এই উপন্যাস রচনার স্বার্থে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয় এবং তা প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন হয় জুলাই মাসে। অতঃপর উপন্যাসটি আরও

প্রায় চার মাস সময় নিয়ে নভেম্বরে শেষ করা হয়। সত্যনির্ভর এই উপন্যাসের তথ্য অনুসন্ধানে ২৫শে মার্চ তারিখে রাজারবাগে কর্মরত এবং প্রথম প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্য ব্যতীতও রাজারবাগের আশেপাশে বসবাসরত অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, স্মরণিকা, প্রবন্ধ থেকেও তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যসমূহ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে ২৫শে মার্চে রাজারবাগে যে প্রতিরোধযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার সবকিছু কারো একার জানা নেই কিংবা কোথাও একত্রীভূত করা নেই। সবকিছুই খণ্ড খণ্ড এবং অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। কারণ সকলেই তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটাই শুধু জানেন। এজন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনা শেষে সমন্বয়ের মাধ্যমে মূল সত্যটা উপন্যাস আকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

উপন্যাসটিকে গতিশীল রাখার জন্য কিছু বর্ণনাতে কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হলেও মূল সত্যকে যতটা সম্ভব অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। চূড়ান্ত সত্যগুলোকে পাদটীকার মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে যেন পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন সত্যতার ব্যাপ্তি কতটুকু। আবার এটাও সত্য, উপন্যাসকে পাঠোপযোগী রাখতে পাদটীকার বাহুল্যও হ্রাস করা হয়েছে। এজন্য এই উপন্যাসে পরিশিষ্ট সংযুক্ত করা হয়েছে যেন সত্যসমূহ আরও প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে পাঠক যেমন উপন্যাসটিতে গতিশীলতা পাবেন, তেমনি চূড়ান্ত সত্যগুলো সহজেই চিহ্নিত এবং অনুধাবন করতে পারবেন। তবে চরিত্রগুলোর বাস্তবতা সম্পর্কে চূড়ান্ত ধারণা পেতে সম্মানিত পাঠকদের উপন্যাস পঠনশেষে অবশ্যই পরিশিষ্ট ১ পড়া বাঞ্ছনীয়।

'নক্ষত্রের রাজারবাগ' উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে যারা আমাকে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন তাদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষ করে রাজারবাগে স্বাধীনতার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহায়তা এবং আন্তরিকতাকে সর্বদাই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। পাশাপাশি প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং প্রতক্ষ্যদর্শী যেসকল ব্যক্তিবর্গ সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন তাদের প্রতি জানাই আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা। উপন্যাসটি লেখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল জনাব হাসান মাহমুদ খন্দকার বিপিএম, পিপিএম, এনডিসি, অতিরিক্ত আইজি (এ অ্যান্ড ও) জনাব এ. কে. এম. শহীদুল হক চৌধুরী, বিপিএম, পিপিএম, জনাব বেনজীর আহমেদ বিপিএম, কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ, জনাব হাবিবুর রহমান, উপপুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর), ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ-সহ অন্য যেসকল সদস্য আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই তরুণ চিত্রনির্মাতা জনাব ফখরুল আরেফিন খানের প্রতি যিনি আমাকে গবেষণাকার্যে

নানাভাবে সহায়তা করেছেন। আরও কৃতজ্ঞতা জানাই রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল ভাইকে যিনি সব সময় আমাকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস রচনায় দারুণভাবে উদ্‌বুদ্ধ করতেন। এছাড়া আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী যারা এই উপন্যাস রচনায় সর্বদা আমার পাশে ছিলেন এবং আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও আমি প্রকাশ করছি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

'নক্ষত্রের রাজারবাগ' উপন্যাসটি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পটভূমিতে রচিত হওয়ায় অত্র উপন্যাসে সকল পুলিশ সদস্যের ১৯৭১ সালের পদবি ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীতে যারা উচ্চতর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন আশা করছি তারা বিষয়টি মার্জনার দৃষ্টিতে দেখবেন। উপন্যাসটির রচনায় আন্তরিকতার ঘাটতি না থাকলেও সকল ভুলত্রুটি যে পরিহার করা সম্ভব হয়েছে— এ দাবি করা দুঃসাধ্য। তাই অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিগুলো পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলেই আমার প্রত্যাশা। পাশাপাশি এই উপন্যাসে যেসকল বিষয়, বিশেষ করে রাজারবাগে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধের সংঘটন, রাজারবাগ পুলিশকর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্বাধীনতার প্রথম বুলেট নিক্ষেপ, রাজারবাগ এবং ঢাকা আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ সর্বপ্রথম পুলিশ ওয়্যারলেস থেকে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া-সহ যুদ্ধের সেসকল বর্ণনা সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেসকল বিষয়ে যে-কোনো যুক্তি, দাবি, মত, দ্বিমত, পরামর্শ সাদরে গ্রহণযোগ্য।

মোশতাক আহমেদ

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

সালাম 'বাংলাদেশ' বলার সময় বুঝতে পারল তার নাক-মুখ দিয়ে টপটপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অবশ্য রক্তের ফোঁটা কোথায় পড়ছে তা সে দেখতে পাচ্ছে না। দেখার সুযোগও নেই। একটার পর একটা বুটের লাথি এসে পড়ছে তার শরীরের ওপর। প্রত্যেকবারই তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠছে সে। নিজের অজান্তেই চোখ বন্ধ হয়ে আসছে তার। তবে মুখে ঠিকই বলে যাচ্ছে, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

পাকিস্তানি এক সৈনিক এবার চুলের মুঠি ধরে সালামের মাথাটা উঁচু করল। তারপর মাথাটা জোরে ঝাঁকি দিয়ে বাধ্য করল চোখ খুলতে। সালামের চোখের সামনে এখন যা কিছু আছে সবই উলটো। কারণ তার পাদুটো বেঁধে তাকে ছাদের সিলিঙের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। এ মুহূর্তে তার পা ওপরের দিকে, মাথা নিচের দিকে। এজন্য সবকিছু সে উলটো দেখছে।

সালামের চোখের একেবারে সামনে বিহারি আব্বাস হাঁটু গেড়ে বসে আছে। আব্বাসকে তারা সবাই অপছন্দ করে। আব্বাস হলো পাকিস্তানিদের দালাল। আব্বাসের জন্যই আজ তারা সবাই ধরা পড়েছে। ধরা পড়ার পর তাদের সবাইকে চোখ বেঁধে নিয়ে আসা হয় এই টর্চার সেলে। এককোনায় পড়ে আছে জাহাঙ্গীর, ইমান, শাহজাহান, হাকিম আর তার ওস্তাদজি বিনয়। সবারই হাত-পা বাঁধা। শাহজাহানের অবস্থা খুব খারাপ। কিছুক্ষণ আগে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে, বমি করে দিয়েছে সে। কিন্তু কিছুতেই সে তার দেশকে 'পাকিস্তান' বলেনি, তার ভাষা 'উর্দু' বলে স্বীকার করেনি। এমনকি তাদের গোপন পরিকল্পনার কোনো অংশ ফাঁসও করেনি। সালামও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শত অত্যাচারে শাহজাহানের মতো অটল থাকবে বলে ঠিক করেছে। কোনোভাবেই মুখ খুলবে না। তবে তার মানসিক শক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে। অত্যাচারের তীব্রতা এখন একেবারে অসহনীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এভাবে আর কিছুক্ষণ তার ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালানো হলে সে আর তার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতে পারবে কি না সন্দেহ আছে। তবে সে অনুভব করেছে

যখন তার ওপর নির্যাতন করা হয় সে 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' বলে চিৎকার করলে যন্ত্রণা অতটা অনুভূত হয় না। তাই 'বাংলাদেশ' ছাড়া সে আর কোনো শব্দ উচ্চারণ করছে না। এমনকি কিছুক্ষণ আগে তার শরীরে গরম সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হলেও সে কিছু বলেনি। আগের মতো শুধু 'বাংলাদেশ'ই বলেছে।

বিহারি আব্বাস একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেটে জোরে টান দিয়ে আব্বাস তার মুখের ওপর ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল, সালাম, তুই চালাক মানুষ। বোকামি করিস না। উনারা যা কিছু জানবার চায় সব বইলা দে।

সালাম কোনো কথা বলল না। একদৃষ্টিতে শুধু আব্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আব্বাস আবার বলল, সালাম, তুই সবই বলবি। মাঝখানতে শুধু প্যাঁদানি খাবি। খাইতে চাইলে খা। তুই যদি ইচ্ছা কইরা প্যাঁদানি খাস আমি তো আর কিছু করবার পারব না।

সালাম এবারও কোনো কথা বলল না।

অব্বাস এবার তার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, অন্তত এইটুকু স্বীকার কর তোর দ্যাশের নাম পাকিস্তান।

না, আমার দ্যাশের নাম বাংলাদেশ। চিৎকার করে উঠে বলল সালাম।

আব্বাস এবার রেগে উঠে বলল, আর তোর ভাষা?

বাংলা, বাংলা। বাংলাই আমার ভাষা।

আব্বাস ধমকে উঠে বলল, না, বল উর্দু।

না, আমার ভাষা বাংলা, আমার দ্যাশ বাংলাদেশ। আমরা বাঙালি, আমরা সবাই বাঙালি।

আব্বাস চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, শালা কুত্তার বাচ্চা, তুই মর।

কথাগুলো বলে আব্বাস দূরে সরে গেল। আর তখনই বুটের ভয়ানক এক লাথি এসে পড়ল সালামের কাঁধের ওপর। এবার সালামের মনে হলো লাথির চোটে তার কাঁধের হাড় বুঝি ভেঙেই গেল। অনেক কষ্টে ব্যথাটা হজম করল সে।

সালামের যন্ত্রণা দেখে আব্বাস বাঁকা হাসি হাসছে। আব্বাসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক পাকিস্তানি আর্মি অফিসারও হাসছে। তার হাসিটা আব্বাসের মতো বিস্তৃত না হলেও ভয়ংকর। কারণ কিছুক্ষণ আগে ঐ অফিসার শাহজাহানকে যেভাবে নির্যাতন করেছে তা এক কথায় পৈশাচিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। ঐরকম নির্যাতন তার ওপর করলে নির্ঘাত সে মারা যাবে। শাহজাহান যে এখনো কীভাবে বেঁচে আছে তা তার মাথায় ঢুকছে না।

আর্মি অফিসার এবার ধীরে ধীরে সালামের কাছে এগিয়ে এলো। তারপর

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তুম্ বাঙালি হো, তোমহারা জবান বাংলা, উর্দু নেহি, শালা কুত্তাকা বাচ্চা। দেখো তুম্ বাঙালি কা কিয়া হাল হোগা?

কথাগুলো বলেই অফিসার উলটো দিকে ঘুরল। তারপর কোমর থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে মুহূর্তের মধ্যে তিনটা গুলি করল নিচে পড়ে থাকা শাহজাহানের বুক বরাবর। হাত-পা বাঁধা শাহজাহানের শরীরটা কয়েকবার নড়ে উঠে তারপর এক সময় স্থির হয়ে গেল। ভয়ে জাহাঙ্গীর খানিকটা পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। আর তা দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল পাকিস্তানি অফিসার। নিজে থেকেই টেনে নিয়ে এলো জাহাঙ্গীরকে। তারপর বুটের গোড়ালি দিয়ে জোরে চেপে ধরল জাহাঙ্গীরের ডান হাতের আঙুলগুলো।

তীব্র যন্ত্রণায় হাত-পা বাঁধা জাহাঙ্গীর মরণচিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকারে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠল সালাম-সহ অন্য সবার। তবে কেউ টুঁ শব্দ করল না।

প্রায় এক মিনিট পর হাতের ওপর থেকে পা সরাল অফিসার। ততক্ষণে জাহাঙ্গীরের আঙুলগুলো একেবারে থেঁতলে গেছে। প্রত্যেকটা আঙুল থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। একটা আঙুল ঝুলে আছে বিচ্ছিরিভাবে। সালাম বুঝতে পারল জাহাঙ্গীর যদি ভাগ্যগুণে এবার বেঁচেও যায় এ জীবনে তার আঙুল আর ভালো হবে না। সারাজীবন তাকে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

অফিসার অবশ্য এবার আর জাহাঙ্গীরের ওপর চড়াও হলো না। সে আবার ফিরে এলো সালামের কাছে। তারপর পিস্তলটা সালামের মুখের ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে শেষে নিশানা স্থির করল ডান চোখের ওপর। তারপর হিসহিস করে বলল, আভি তুম বাতাও, তোমহারা মুল্লুককা নাম কিয়া হ্যায়?

সালাম কোনো কথা বলল না।

You stupid! Will not speak anything?

সালাম চুপ।

অফিসার এবার পিস্তল দিয়ে হঠাৎই সজোরে আঘাত করল সালামের কপাল বরাবর। আর তাতে সালামের কপাল ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো।

সালাম তারপরও চুপ থাকল।

অফিসার ভয়ংকরভাবে রেগে উঠে বলল, You son of bitch, go to hell.

কথাগুলো বলে অফিসার উঠে দাঁড়াল। তারপর নিজেই এবার কষে লাথি হাঁকাল সালামের পিঠ বরাবর। ব্যথায় চিৎকার করে উঠতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত চিৎকার করল না সালাম। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল সে।

সালামের শরীর এখন শূন্যে দুলছে। অঝোরে রক্ত ঝরছে তার নাক-মুখ আর ফাটা মাথা দিয়ে। সেই রক্ত দেখে উল্লসিত অফিসার চিৎকার করে বলতে

থাকল, Bloody bitch, go to hell, go to hell.

সালাম বুঝে গেল মৃত্যুই তার একমাত্র পরিণতি। এজন্য সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। বেঁচে থাকা অবস্থাতেই ঘৃণাটা প্রকাশ করে যাবে। তাই ঠিক যে মুহূর্তে অফিসারের মুখটা সামনে পেল তখনই তার মুখ বরাবর থুতু ছুড়ল।

আর যায় কোথায়? আশেপাশের সৈনিকরা চারপাশ থেকে এসে পাগলের মতো সালামকে কিল, ঘুসি, লাথি মারতে শুরু করল। সালাম অনুধাবন করল তার মুত্যু আর বেশি দূরে নেই। তাই শেষবারের মতো সে পরপর দুবার শরীরের সমস্ত শক্তিতে চিৎকার করে বলে উঠল, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

সালামের চিৎকারে সৈনিকরা এতটাই ভয় পেয়ে গেল যে তারা খানিকটা পিছিয়ে গেল। এমনকি অফিসারও পিছিয়ে গেল খানিকটা। তবে পরমুহূর্তেই সে সামনে এগিয়ে এলো। তারপর পিস্তলটা তাক করল সালামের হৃৎপিণ্ড বরাবর।

সালাম জোরে শ্বাস নিল। সে অনুধাবন করল এ জীবনে এটাই তার শেষমুহূর্ত। তাই শেষবারের মতো সবাইকে দেখতে চারপাশে তাকাল। কিন্তু সবাইকে আর দেখা হলো না। গর্জে উঠল অফিসারের পিস্তল।

সালাম তার কাঁধে তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল। চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎই পাশে কাউকে সে ম্যাচের কাঠি জ্বালাতে দেখল। তারপর দেখল কেউ একজন চেরাগ জ্বালাচ্ছে। চেরাগের আলো খানিকটা উজ্জ্বল হতে বুঝতে পারল তাদের বাড়ির রাখাল রহমত আলো জ্বালিয়েছে। সে অবাক হয়ে বলল, রহমত তুই!

রহমত চেরাগটা সালামের মুখের কাছে এনে বলল, ভাইজান, আমি তো আপনের সাথে এই ঘরেই শুইছি। আপনের কী হইছে?

কী হইছে মানে?

আপনে 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' বইলা চিল্লাইতেছিলেন। আর এহন দেহি চৌকি থাইকা নিচে পইড়া গেছেন।

সালাম ভালোমতো তাকাতে বুঝল সে এতক্ষণ যা কিছু দেখেছে সবই ছিল স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে সে চৌকি থেকে পড়ে কাঁধে ব্যথা পেয়েছে। আর স্বপ্নে এই ব্যথাটাকেই সে গুলির আঘাত বলে অনুভব করেছে।

রহমত তার সাথে তার ঘরেই শুয়েছিল। রহমত ছিল মাটিতে আর সে চৌকিতে। সম্ভবত স্বপ্নে সে যে চিৎকার করেছে সেই চিৎকার শুনে রহমত ঘুম থেকে উঠেছে।

রহমত আবার বলল, কী হইছে ভাইজান?

না তেমন কিছু না। দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।

তাইতো বলি আপনে চৌকির ওপরতে ক্যান পড়লেন!

তোর ওপর পড়ি নাই তো? তুই ব্যথা পাস নাই তো?

না ভাইজান। কী দুঃস্বপ্ন দ্যাখছেন?

তেমন কিছু না। তুই ঘুমা।

লবণ-পানি আনব ভাইজান?

না। তুই ঘুমা।

সালাম আবার চৌকির ওপর উঠে এলো। তারপর শরীরের ওপর কাঁথাটা টেনে শুয়ে পড়ল। মনে মনে বলল, আমি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখি নাইরে রহমত, দেখছি স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্ন হইলো স্বাধীনতার স্বপ্ন, দ্যাশ স্বাধীনের স্বপ্ন।

২২শে মার্চ ১৯৭১।

সালাম দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই গ্রামের খালের পাড়ে। দৃষ্টি তার খাল পেরিয়ে সবুজ ফসলে ঢাকা বিলের ওপাশে উদীয়মান লাল সূর্যের দিকে। জীবনে সে অনেক অনেকবার সূর্যোদয় দেখছে। কিন্তু তার কেন যেন মনে হচ্ছে আজকের সূর্যোদয়টা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সূর্যোদয়। কারণ দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঝে লাল সূর্যটাকে তার মনে হচ্ছে সত্যি যেন কোনো শিল্পীর হাতে আঁকা সুনিপুণ এক শিল্পকর্ম! পূতপবিত্র সকালের ঝিরঝির বাতাসে দোল খাওয়া ফসলের সাথে লাল টকটকে সূর্যটা যেন হঠাৎ হঠাৎ দুলে উঠছে। সালামের মনে হলো তার চোখের সামনে দোল খাওয়া ঐ সবুজ ফসল আর লাল সূর্য কীসের যেন প্রতিচ্ছবি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে করতে পারছে সে। এ যে তার পতাকা, তার দেশের স্বপ্নের পতাকা, সাত কোটি মানুষের হৃদয়ের পতাকা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসার পতাকা। এরকম উপলব্ধি তার মধ্যে ভালোলাগা আর ভালোবাসার অপূর্ব এক প্রশান্তির সৃষ্টি করল। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দিগন্তবিস্তৃত অতি প্রিয় লাল-সবুজ পতাকার দিকে।

সালাম কতক্ষণ এভাবে তাকিয়ে ছিল বলতে পারবে না। সে বাস্তবে ফিরে এলো মেঘের আত্মাকাঁপানো গুরুগম্ভীর গর্জনে। তারপরই ঘটল ভয়ংকর ঘটনাটা। তীব্র এক বাতাসের ঝাপটা নুইয়ে দিলো সবুজ ফসলগুলোকে। আর কোথা থেকে আসা কালো এক মেঘ ঢেকে দিলো উদীয়মান লাল সূর্যটাকে। সামনের দূর আকাশে মনোমুগ্ধকর লাল-সবুজের আলিঙ্গনের দৃশ্যের স্থলে এখন শুধু কালো মেঘের ছুটাছুটি আর বিদ্যুতের ঝলকানি। সালাম দৃশ্যটা সহ্য করতে পারল না। সে চোখ ফিরিয়ে আনল খালের টলটলে স্বচ্ছ পানির ওপর। ততক্ষণে তার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছে। এই দীর্ঘশ্বাস তার নিজের দীর্ঘশ্বাস না, সাত কোটি মানুষের দীর্ঘশ্বাস— যারা আজ অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত; যাদের দেশমাতৃকা আজ থেকেও নেই, স্বাধীনতা এসেও আসে না, পাতাকা উড়েও ওড়ে না, বারবার শুধু হারিয়ে যায় দূর আকাশের কালো ঐ মেঘের ঘনঘটা আর গুরুগম্ভীর গর্জনের মাঝে।

সালামের চোখ বরাবর পানির মধ্যে অনেকগুলো খলসে মাছ ছুটে বেড়াচ্ছে। ওদের সাঁতারের মধ্যে কী চমৎকার প্রাণবন্ততা! দেখলেও ভালো

লাগে। সালাম অনুধাবন করল ভালোলাগার অন্যতম কারণ ওদের স্বাধীনতা। কেউ ওদের চলার পথকে রুখে দিচ্ছে না, কেউ ওদের চাওয়াপাওয়াকে সীমিত করে দিচ্ছে না, কেউ ওদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করছে না। তাইতো ওরা সুখী, দারুণ সুখী, স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগে চরম তৃপ্তও বটে!

সালামের দৃষ্টি এবার মাছগুলোর পাশে ছোট্ট একটা কচুরিপানার ওপর পড়ল। একটা উজ্জ্বল লাল রঙের ফড়িং বারবার চেষ্টা করছে কচুরিপানাগুলোর ওপর বসতে। কিন্তু পারছে না। খালের হালকা ঢেউ আর বাতাসে কচুরিপানাগুলো এদিক-ওদিক দুলতে থাকায় ফড়িংটার জন্য স্থির হয়ে বসা সত্যি কঠিন হয়ে পড়েছে। তারপরও চেষ্টা করছে ফড়িংটা, হয়তো এক সময় সফল হবে।

সালামের বাম পাশে উঁচু মাটির রাস্তা। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে সামনের এই খাল। আর খালের ওপর বাঁশের চার[১] দুপাশের দুই গ্রামকে সংযুক্ত করেছে। সালাম একবার ভাবল সে চারের ওপর থেকে লাফ দেবে। পরক্ষণে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। ছোটোবেলার অনেক শখ এ বয়সে এসে পূরণ করা সাজে না। সে এখন আর সাত-আট বছরের দুরন্ত ছেলে না, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে কর্মরত একুশ বছর বয়সি একজন গর্বিত পুলিশ কনস্টেবল। এই বয়সে চারের ওপর থেকে লাফ দেওয়াটা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল সে লাফ দেবে। মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা শখ পূরণ করে মুহূর্তের জন্য হলেও ফিরে যাবে সেই ছোট্টবেলার স্মৃতিতে। তার জন্য সুবিধার হচ্ছে এত সকালে এই খালপাড়ে আর কেউ নেই। কাজেই সে এখানে যে ছেলেমানুষি করবে তা কেউ দেখতে পাবে না।

সালাম সত্যি সত্যি চারের ওপর উঠে এলো। তারপর তাকাল ছয় ফুট নিচে পানির দিকে। এখানে পানির গভীরতা অনেক বেশি। বারো-চৌদ্দ ফুটের কম হবে না। লাফ দিতে তার কোনো অসুবিধা নেই। ছোটোবেলায় এরকম অনেক লাফ সে দিয়েছে। আজও দিতে পারবে। এরকম উপলব্ধি করে সালাম দুহাত উঁচু করে বুক ভরে শ্বাস নিল। তারপর শূন্যে লাফ দিয়ে শরীরটাকে ছুড়ে দিলো সামনের দিকে। মাত্র এক সেকেন্ড। তারপরই হারিয়ে গেল পানির মধ্যে। ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকল নিচে আরও নিচে। এক সময় সে খালের একেবারে নিচ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এখানে চারপাশটা অন্ধকার। এত অন্ধকার যে কিছু দেখা যায় না। হঠাৎই সালামের মনে হলো পানির মধ্যে বিশাল একটা কিছু নড়ে উঠল। তারপরই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ভয়ংকর কালো

---

১ *একপ্রকার সাঁকো যা খাল বা ছোটোখাটো জলাধার পেরোনোর জন্য গ্রাম এলাকায় বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়।*

একটা অবয়ব। অবয়বটা কীসের সে বুঝতে পারল না। ভয়ে তার আত্মা একেবারে শুকিয়ে আসার উপক্রম হলো। আর দেরি না করে সে দ্রুত ওপরে উঠতে শুরু